

উম্মাহর মহীকুহ, পর্ব-১

Asif Adnan

May 1, 2019

6 MIN READ

আমাদের আজকের আলোচনা একজন ব্যতিক্রমী চরিত্রকে নিয়ে।

গীবত, পরনিন্দার কিংবা অপরের মানহানির ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) এর বক্তব্য আগে একবার স্মরণ করে নেয়া যাক। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একবার সাফিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ব্যাপারে আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর কাছে জানতে চাইলেন। সাফিয়ার ব্যাপারে তুমি কী মনে কর? জবাবে আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তার হাত দ্বারা এক ধরনের ইঙ্গিত করলেন। কেবল সাধারণ একটা ইঙ্গিত। অধিকাংশ বর্ণনায় এসেছে এষ্ট ইঙ্গিতের মাধ্যমে আইশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বোঝাতে চেয়েছিলেন যে সাফিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) একটু বেঁটে। যদিও আইশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) মুখে কোন শব্দ উচ্চারণ করেননি কিন্তু সেই ছোট্ট ইঙ্গিতের ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) বললেন, যদি তুমি এটিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে তাহলে তা পানির রঙ পরিবর্তন করে ফেলতে পারত।

ছোট্ট অথচ কত সুক্ষ্ম এবং গুরুতর একটি ব্যাপার, চিন্তা করুন! সুতরাং আমরা কী বলছি তা নিয়ে আমাদের অত্যন্ত সতর্কতাকা উচিত। কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন:

তোমরা কি তোমাদের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে?" (৪৯:১২)

ধরুন, আপনার পরিচিত কেউ মারা যাবার পর র আপনি তার শরীরের উপর ছুরি চালিয়ে তার গোশত কেটে কেটে খাচ্ছেন; কী জঘন্য ব্যাপার! আর এভাবেই আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সম্মানহানী করা বা গীবত করার তুলনা করেছেন। শুধু গীবত থেকে বিরত থাকাই যথেষ্ট না, বরং মুসলিম ভাইদের সম্মান রক্ষাও আমাদের কর্তব্য। আজ এমন অনেক মুসলিম ভাই আছেন যারা প্রতিনিয়ত গীবতের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছেন। তবে একটু চিন্তা করলে দেখা যায় বর্তমান অবস্থায় এটা মোটেই অসম্মানের কিছু না। যারা গীবত করছেন বা কুৎসা রটাচ্ছে তাদের দিকে তাকালে মনে হয় আজ কুৎসার লক্ষ্যবস্তু হওয়াটাও সম্মানের ব্যাপার। মডার্নিস্ট, সংস্কারপন্থী কিংবা আপোসকামীরা যদি আপনাকে বিভিন্ন রকম ট্যাগ দেয়, তিরস্কার কিংবা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে তাহলে আপনার খুশি হওয়া উচিত। তারা যত আপনাকে অপমানিত করতে চাইবে আপনি তত দিন দিন ওপরে উঠবেন। তবে নিজের সামনে কোন মুসলিম ভাইয়ের গীবত হতে দেখলে আপনার নির্দিষ্ট করণীয় আছে।

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে রটানো কুৎসা প্রত্যাখান করে কিংবা কেউ গীবত করছে এমন কোন মজলিসে যদি কেউ বলে 'চুপ কর!', তাকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দেয়া নিজের উপর ওয়াজিব করে নেন।

মুসলিম ভাইয়ের বিরুদ্ধে কটু কথা বলা থেকে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন, আপনি বললেন, 'চুপ কর! যদি এই অবাস্তব কথা বলা তুমি বন্ধ না করো তাহলে আমি চললাম'। তাহলে আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করা নিজের ওপর ওয়াজিব করে নেন।

গীবতের প্রতিবাদ করুন না পারলে স্থান ত্যাগ করুন। হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (ﷺ) বলেন,

যে ব্যক্তি গীবাহ করার মাধ্যমে ভাইয়ের গোশত খায়, তাকে আগুনে পোড়ানো আল্লাহর অধিকার। (আহমাদ -৬/৪১) (আত তাবারানী) ২৪/১৭৬) আলবানী রহ: একে সহীহ বলেছেন।

একদিকে গীবাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তিকে তিনি জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়াকে আল্লাহ নিজের অধিকার সাব্যস্ত করেছেন যে, অন্যদিকে একই রকম আরেকটি হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানহানী করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আল্লাহ জাহান্নামের আগুনের হন্কা তার মুখ থেকে সরিয়ে নিবেন।

একথাগুলো স্মরণ রাখবেন।

* * *

আজ আমরা এমন একজন মহান ব্যক্তির কথা আলোচনা করবো যার ব্যাপারে যা বলা হয়ে থাকে তার সাথে বাস্তবতার অনেক ফারাক। আমাদের উচিত তার সম্মান রক্ষা করা। এটা আমাদের জন্যও সম্মানের ব্যাপার। কারণ আমরা না চাইলেও তিনি ঠিকই সম্মানিত হতে থাকবেন। এরা হচ্ছেন উম্মাহর মহীরুহ। ইতিহাসে তাঁদের নাম সোনালী অক্ষরে লেখা। প্রত্যেক যুগের সৎ একনিষ্ঠ মানুষরাও তাঁদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেন। তাই হিংসুকরা যতই মন্দ বলুক না কেন এটা তাঁদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। কিন্তু আমরা যদি তাঁদের সম্মান রক্ষায় কিছু করতে পারি সেটা আমাদের জন্যই সম্মান বয়ে আনবে। ইন শা আল্লাহ এর বিনিময়ে বিচার দিবসে আমরা উত্তম প্রতিদান পাব। এ বিষয়টি আমাদের বোঝা দরকার। এই মহান ব্যক্তির আপনার-আমার সমর্থনের মুখাপেক্ষী নন, তবে তাঁদের সম্মান রক্ষার চেষ্টার মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কারের আশা করি।

আজ যে মহামনীষীকে নিয়ে আমরা আলোচনা করবো, তিনি সম্ভবত গত দু শতাব্দীর সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত মানুষদের একজন এবং সম্ভবত বিদআতী, অজ্ঞ এবং ভন্ডদের কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত মানুষদের অন্যতম।

তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ইবনু সুলাইমান আত তামীমী।

আরব উপদ্বীপে তার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। তিনি ছিলেন একজন বিপ্লবী সংস্কারক এবং মুজাদ্দিদ। গভীর মনোযোগের সাথে তার কাহিনী শুনুন। যে কেউ তার দেখানো পথ ধরে হাঁটতে পারে। তাঁর কাজের সাথে সুলতান নুরুদ্দীন আল-জিংকির কাজের কিছুটা মিল খুজে পাবেন। তবে দুজনের স্বতন্ত্র স্টাইল ছিলো।

ইমাম মুহাম্মাদ আসলে কী করেছিলেন? খুব বিশেষ কিছু না, বরং তিনি যা করেছিলেন আমাদের মাঝে যে কেউই তা করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিজরতের ১১১৫ বছর পর তাঁর জন্ম। অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় ২৫০ বছর আগে। তিনি সাহাবী বা তাবেয়ী ছিলেন না। মাত্র আড়াইশ বছর আগের মানুষ; যার বংশধররা এখনও আরব উপদ্বীপে আমাদের মাঝে বসবাস করছেন।

এ মানুষটার ব্যাপারে বলার আগে সেই সময়টাতে তার চারপাশের অবস্থা কেমন ছিল তা আপনাদের বলতে চাই। তিনি এমন সময়ে জন্ম নেন যখন তাঁর ভাষ্যমতে, ৪০০ বছর ধরে উম্মাহ ভাল কিছু দেখেনি। অন্যায়, অনাচার, দুর্নীতি, বিদআহ, শিরক এর জঞ্জালে ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। আমরা এখানে বিশেষভাবে আরব উপদ্বীপের কথা বলছিলাম। জাযিরাতুল আরব, অর্থাৎ যেটাকে বর্তমানে সউদী আরব, হেজাজ ইত্যাদি নামে আমরা চিনি। সে সময়টা আরব উপদ্বীপ ছেয়ে গিয়েছিল কুব্বায়। কুব্বা হল কবরের ওপরের তৈরি করা গম্বুজ।

বাঁধাই করা এবং গম্বুজওয়ালা বিশিষ্ট কবরগুলোর কাছে মানুষ ইবাদতের জন্য যেত। ঠিক যেভাবে ক্বাবার চারপাশে করা হয় তেমনভাবে মানুষ এ কবরগুলোর চারপাশে তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করতো। আল্লাহর পরিবর্তে কবরবাসীদের কাছে মানুষ বিভিন্ন জিনিষ চাইতো (যেমন সম্পদ, সন্তান, সুস্থতা ইত্যাদি)। আল্লাহকে বিশ্বাস করেও কুরাইশ ৩৬০ দেবদেবীর ব্যাপারে যে কাজগুলো করত অনেকটা সেরকমই। আরবে কিছু বিশেষ গাছ ছিলো; কোন মহিলা গর্ভধারণে করতে অক্ষম হলে সে তখন

এই গাছগুলোর কাছে আবেদন করত। আবার স্ত্রী- মিলিয়ে দেয়ার দোয়া নিয়ে পুরুষরা যেতো সেই নির্দিষ্ট গাছ, কিংবা কবরের কাছে যেতো। আজ হয়তো এসব কথা শুনে আপনি হাসবেন, কিন্তু এটাই ছিল তখনকার বাস্তবতা।

এগুলো সুস্পষ্ট শিরক। মানুষ এসবে লিপ্ত ছিল। সরাসরি আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করা হতো। এমনকি কিছু সাহাবি (রাওয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাইন) এর কবরের ওপর গম্বুজ বানিয়ে তাঁদের কাছে চাওয়া হত, ইবাদত করা হতো।

এভাবেই মূলত শিরকের গোড়াপত্তন হয়। শিরকের উৎপত্তি কিভাবে? ধার্মিক লোকেরা মারা যাবার পর লোকেরা প্রথমে তাঁদের ছবি তৈরি করে। একসময় সেগুলো পরিণত হয় মূর্তিতে। তারপর কালক্রমে একসময় সেই মূর্তিগুলোর ইবাদত শুরু হয়। পৃথিবীতে এভাবেই কিন্তু মানবজাতির মধ্যে শিরক শুরু হয়েছিল।

কেন তারা প্রথমে ছবি সংরক্ষণ করেছিল? তখনকার লোকেরা যুক্তি দিয়েছিল, এই ধার্মিক লোকগুলোর কথা আমাদের স্মরণ রাখতে দাও যাতে আমরাও তাদের মত ধার্মিক হতে পারি। উদ্দেশ্য কিন্তু ভালো ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সেই ছবিগুলোই পরিণত হয়েছিল মূর্তিতে, মিথ্যে ইলাহতে। তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম ভাবল আমরা তো এদের মতো হতে পারব না তাই বরং আমরা এদের ইবাদত করব এবং এটা ছিল চরম ভ্রষ্টতা।

আমরা যে সময়টার কথা বলছি তখন ইয়েমেনেও একই সমস্যা ছিল। ইরাকেও - সেখানকার সেসময় ইমাম আবু হানিফার কবরের ওপর গম্বুজ ছিল, মানুষ সেখানে ইবাদত করতো। ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের অবস্থা ছিল এরচেয়েও শোচনীয়। আলজেরিয়াতেও একই ব্যাপার। মিশরে তো শুধু মূর্তিপূজাই নয় বরং পিরামিড এবং ফিরাউনদের রেখে যাওয়া নিদর্শনগুলোরও ইবাদত করা হতো। এর মাধ্যমে কিছু লোক আবার শিরকপূর্ণ অতীতে ফিরে গিয়েছিল। মৃত এবং কালের গহবরে হারিয়ে যাওয়া ফিরাউনদের স্মৃতিকে তারা আবার পুনরুজ্জীবিত করেছিল। **অথচ আমাদের আলোচনা কোন কাফির সম্প্রদায়কে নিয়ে না, এরা সবাই মুসলিম ছিল।** মুসলিমরা তখন কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ থেকে এতো দূরে সরে গিয়েছিল যে তারা পুনরায় আবার ফিরে গিয়েছিল এসবে। প্রায় প্রত্যেক দেশেই এগুলোর কিছু না কিছু প্রভাব ছিল।

এমনই এক বিশৃংখল অরাজক পরিস্থিতিতে জন্ম নেন মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব। এবং তিনি নিজের কাঁধে তুলে নেন এক বিশাল দায়িত্ব।

* * *

[শায়খ আহমাদ মুসা জিব্রিল হাফিয়াহুল্লাহ এর 'Heroes Of Islam - Muhammad Ibn Abdul Wahhab' থেকে অনূদিত। অনুবাদ করেছেন, আবু মুআয ইবনে শামস]